Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 20
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 09 - 20
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ চিত্রকল্পের প্রয়োগ

মোসাহিদা খাতুন
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়
Email ID: mosahidakhatun1998@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
unique, personality, against, heaven, hell, sympathy, power, grief of son, devil.

Abstract
Meghnadbodh kavya written in 1861 by Michael Madhusudan Dutt is the first significant novel in Poetry literature. Taking the events of the Ramayana as a point, the reader gets a unique taste of each stanza like a pearl in the description of the killing of Ravana's son Meghnad by Lakshmana. Every character in the poem shines in its own personality. The description of the mourning, the description of the royal palace, the description of the war journey, the description of the Ashoka forest or the description of ‘Samagam & Pretpuri’, the poetry has gained more excellence. Along with the story, the use of dialogue, the use of various metaphors creates a resonating emotion in the reader's ears while listening to the poem. Ravana- Indrajit's defeat is finally managed by Shiva. All the gods and goddesses of heaven are eager to kill Indrajit. Even if Indrajit is killed, Ravana will be killed immediately. Every character of Heaven is strategized against Indrajit also known as Meghnad. In the poem of poet madhusudan, it is possible to draw the image of heaven,earth and hell in the order of the first section Abhishek. Nowhere was there a contradiction in the narrative of events or an incompleteness of the story. Although written based on the story of Ramayana, Meghnad Badh gave a new picture in the poem. The poet of the Ramayana intended to evoke sympathy for Ramachandra and aversion to the demons. But the poet of meghnad Badh abandoned this age-old ideal and showed compassion and sympathy towards demons. By the description of the poet, the reader can feel sorry for the demon’s family. The reader is fascinated by the native love of the demon's family, and the reader's grief is aroused by their disaster. Madhusudan did not demonize the demon. Showed like a man and painted like that. Even though the Rakshasas are superior to humans in their prowess and glory, they are humans, they perform sacrifices and worship the gods, for the

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 20
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

sake of the welfare of the demon's wife, husband, and son. Worships Shiva and portrays the perfect image of the Bengali woman in harmony with husband of Pramila.Also, the two queen Chitrangada and Mandadari run to their husband like mad in grief of son.Although he came to Ravana as his wife, in the end his son begged for alms as a subject from the king. Human being Ramachandra is devil.why did he leave Ayodhya Puri and come to Lanka Puri. Seeking this apology, he leaves by hinting at the imminent danger of Lankapuri. Also, the poem is more excellent by addressing the same character by different names.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে প্রথা ভাঙার এক ব্যক্তিদ্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ব্যক্তিজীবনে প্রথা ভাঙার স্রোত এসে পড়েছিল কবি জীবনে; যার অনবদ্য সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এখানে নিজের প্রতিভাবলে শিল্প সৃষ্টিতে মধুসূদন অনবদ্য ভূমিকা নিয়েছেন। বিন্দুর মধ্যে কথার চমৎকারিত্ব সিন্ধু দর্শন বরাবরই সাহিত্যে দেখা যায়। তবে সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু রূপ রামায়ণের ঘটনা গ্রহণ করে রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক রাবণের পুত্র মেঘনাদের নিধন বর্ণনায় মুক্তা বিন্দু সদৃশ্য প্রতিটি সর্গের আলোকচ্ছটায় পাঠক একটা অনন্য লাভ করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

> "কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা -তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাব গুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়।"[১]

মধু কবির কাব্যে প্রতিটি সর্গে অলংকারের বিচ্ছুরণে পাঠকের চোখে কাব্যের প্রতি একটি মোহ ও ভাব গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়। এ কাব্য প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন

> "সত্য বটে কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানাদেশীয় মহাকবিগণের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব মালা গ্রথিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্নসহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন। ...নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন কবি।"[২]

> "সমালোচক হিশেবে যাঁরা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে উৎসাহী, তেমন অনেকে আবার এমনও বলেছেন যে, সিপাহী বিপ্লবের পর যে- নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনা জন্ম নিচ্ছিলো, রাম-রাবণের সংঘর্ষ দিয়ে কবি সেটাকেই প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই রামের বদলে রাবণের পক্ষ নিয়েছে।"[৩]

নয়টি স্বর্গে বিভক্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য'- এ প্রতিটি সর্গের ঘটনার চমৎকারিত্ব কাব্যটি অনন্য মাত্রা পেয়েছে। প্রথম সর্গ 'অভিষেকো'-তে রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ বিজয় আনন্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হচ্ছে না। ভাতৃ হত্যার প্রতিশোধে পিতা বর্তমান থেকে পিতার আদেশে মেঘনাদ তথা ইন্দ্রজিৎ অভিষিক্ত হচ্ছেন। 'মকরাক্ষ' দূতের মুখে পুত্র হত্যার সংবাদ পেয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রথমে আক্ষেপ করেন।

বীরবাহুর মৃত্যুতে জননী চিত্রাঙ্গদা দেবীর সভাগৃহ প্রবেশ ও রাবণের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা সমগ্রটাই চিত্রকল্প দিয়ে নির্মিত। চিত্রাঙ্গদা দেবীর সভাগৃহ প্রবেশের বর্ণনায়-

"শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা ঘন
নিশ্বাস-প্রলয় বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা

আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব!''[৪]

চিত্রাঙ্গদা দেবীকে দেখে রাবণ সান্ত্বনা স্বরূপ আক্ষেপ বাক্য প্রকাশ করেন-

''নিদাঘেযেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী।
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর!''[৫]

প্রত্যুত্তরে চিত্রাঙ্গদা দেবী রাবণের প্রতি অভিযোগের অঙ্গুলি তোলেন। রাম কেন অযোধ্যাপুরী ছেড়ে লঙ্কাপুরি তে এসেছেন-

''বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি?কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকূলে, মজিলা আপনি!''[৬]

মেঘনাথ ধাত্রী প্রভাষা রাক্ষসী রূপ ধরে লক্ষীদেবী মেঘনাদের কাছে বীরবাহুর মৃত্যুর সংবাদ জানায়। প্রমোদ উদ্যানে ব্যস্ত মেঘনাদ ভ্রাতৃ হত্যার সংবাদ শুনে ক্রোধের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার বর্ণনায়-

"ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়!''[৭]

পিতা পুত্রের লঙ্কাপুরীর প্রথম সাক্ষাতে শোক মুহ্যমান হয়ে পড়ে। পুত্র ও ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে রাবণ শোক ও ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাই ইস্ট দেবের পুজা করে নিকুম্ভিলযজ্ঞ সাঙ্গ করে আগামী প্রভাতে যুদ্ধ যাওয়ার জন্য গঙ্গাজলে মেঘনাদ তথা ইন্দ্রজিৎকে অভিষেক করলেন।

দ্বিতীয় সর্গের 'অস্ত্রলাভো'তে মেঘনাদের অস্ত্রলাভ নয়, রামানুজ লক্ষনের দৈবী অস্ত্রলাভের বর্ণনা ও যুদ্ধের আগে দেবকুলের চিন্তা ও বিচলিত অবস্থার বর্ণনার পাশাপাশি রাক্ষসপুরীতে মেঘনাদের যুদ্ধে যাবে ও যুদ্ধে লঙ্কাপুরী বিজয় হবে এই নিশ্চিত আশাতে রাক্ষসপুরী আনন্দে মেতে উঠেছেন। ইন্দ্রের বৈজয়ন্তধামের দেবসভার নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। ইন্দ্র সহ ইন্দ্রানী দেবী কাত্যায়নীর কাছে গিয়ে ধর্না দিয়েছেন শিবের সন্তান তুল্য রাবণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে রাবণকে পরাজয় করানোর জন্য শিবের কাছে অনুরোধ করতে বলেন। দেবী কাত্যায়নী ইন্দ্রসহ ইন্দ্রাণীর কথা শিবের কাছে রাবণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে অস্বীকার করেন। শিব-উমা প্রিয়কন্যা লক্ষীদেবী লঙ্কাপুরীতে বাধা হয়ে আছে তাকে উদ্ধারের জন্যেও রাবণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে অস্বীকার করেন এমত সময়-

''মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী; ''হে নগনন্দিনি,
দাশরথিরথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।''[৮]

বিজয়া সখী জানায় নীলোৎপলাঞ্জলী দিয়ে কৌশল্যা-নন্দন রামচন্দ্র দেবীর পায়ে পূজা করছেন, তার বিপদের উদ্ধারের জন্য। এইবার দেবী কাত্যায়নী ভক্তের আকুতি রক্ষার জন্য শিবের কাছে যাওয়ার প্রস্তুত নিচ্ছেন। নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 20
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মনমোহিনীরূপে সেজে মদনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন কৈলাস পর্বতের চূড়ায় শিবের গৃহে। দেবকুল, সন্তানকুলের চেয়ে ভক্তের আকুতি যে শ্রেষ্ঠ তা দেবী কাত্যায়নী তথা উমার ব্যবহারের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। কৈলাশ পর্বতে বাহ্য-জ্ঞান-হত, তপস্যার সাগরে মগ্ন শিব; উমার আদেশে মদন কামশর নিক্ষেপ করলে শিবের প্রতিক্রিয়া ও কামের ত্রাসকে মধুকবি সুন্দর ভাবে এঁকেছেন-

“নড়িল মস্তকে
জটাজুট, তরুবাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে!
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে!
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।”[৯]

মদন বিহনে রতি ব্যথায় আকুল হয়ে নিজে গৃহে তিষ্টতে না পেরে হৈমদ্বারে অবনত মুখে ভয়-শঙ্কা-ত্রাস ও পূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিবের আদেশে মায়াদেবীর প্রাসাদে যাওয়ার সংবাদ ইন্দ্রকে জানানোর জন্য হৈম গৃহে উপস্থিত হয় মদন। প্রবেশ পথে রতি হারানো ধন ফিরে পেল অশ্রুপাত, প্রেম আলিঙ্গনের পাশাপাশি রতি জানতে চায় মদন কিভাবে ফিরে এসেছে। প্রত্যুত্তরে-

“ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি!
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি!”[১০]

মায়াদেবীর প্রাসাদ থেকে ইন্দ্র অস্ত্র নিয়ে চিত্ররথকে দিয়ে সে অস্ত্র লঙ্কাপুরীতে দাশরথিকে অর্পণ করেন। বিলম্ব না হয় তাই ইন্দ্রের রথ নিয়ে যেতে বলেন। ইন্দ্রের শঙ্কা ‘পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে,/বাধায় বিবাদ রক্ষঃ’... তাই ইন্দ্র মেঘ, বজ্র,বিদ্যুৎ, প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে আকাশ অন্ধকার করে দিয়ে অস্ত্র প্রেরনের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছে তা নিখুঁত বর্ণনায় চমৎকারিত্ব ফুটে উঠেছে। অস্ত্র প্রেরনের পরে চিত্ররথ দেবরথে করে দেবপুরে চলে গেলে রাক্ষসপুরীর বর্ণনা অন্যরূপ পেয়েছে-

“থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলধি;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়’; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে শিবা
শবাহারী; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী — মত্ত বীরমদে।”[১১]

তৃতীয় সর্গে 'সমাগমো'তে যুদ্ধের জন্য অভিষিক্ত রাবণ পুত্র মেঘনাথ কিংবা দশরথ পুত্র রাম-লক্ষণের দৈবী অস্ত্র লাভের পরে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রস্তুতের সমাগম নয়। প্রমোদ উদ্যানে একাকী বিরহিনী দেবশত্রু কালনেমি দৈত্যের কন্যা প্রমীলা লঙ্কাপুরীতে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সমাগম করেছে। প্রমোদ-উদ্যানের নিখুঁত বর্ণনার পাশাপাশি পতি বিরহে যুবতীর কাতরতা ও নিশার যন্ত্রণার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। বাসন্তী সখির পরামর্শে প্রমীলা ফুল তুলে সুন্দর করে মালা গেঁথেছেন। মালা গাঁথার পরে স্বামী আসার বিলম্বের জন্য প্রমীলা লঙ্কাপুরিতে যাওয়ার কথা বললে বাসন্তী জানায় রামচন্দ্রের সৈন্যরা ঘিরে আছে লঙ্কাপুরীতে আমরা প্রবেশ করতে পারবো না। এই সংবাদের প্রমীলা শোক ভুলে ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। তার বর্ণনায়-

"রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী!
কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কুল-বধূ;"[১২]

পরবর্তীতে প্রমীলার রনসজ্জার, বেশভূষার বর্ণনা, পদচারনের ভঙ্গি ও বাকচাতুর্য উচ্চস্তরের চিত্রকল্প অঙ্কিত হয়েছে। পশ্চিম দুয়ারে প্রবেশ করে প্রমিলা নিজের উপস্থিতি জানানোর জন্য শত শঙ্খের ধ্বনি ও ধনুকের শব্দের পরবর্তী অবস্থার বর্ণনায়-

"কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গমে
সাদীবর : সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্ব্বত গহ্বরে সিংহ; বন-হস্তী বনে;
ডুবিল অতলজলে জলচর যত!"[১৩]

এমত আতঙ্কের সময় প্রচন্ড ক্রোধে পশ্চিম দুয়ারে এসে উপস্থিত হন পবনপুত্র হনু। হনু নিজের পরিচয় দিয়ে প্রমীলা কে ক্ষুদ্র কীট তুল্য মনে করে বলেন-

"জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে; -
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"[১৪]

প্রত্যুত্তরে ক্রোধের প্রমীলা বলে-

"বর্ব্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি।
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ?"[১৫]

প্রমীলার ক্রোধে হনু ভয় পেয়ে মনে মনে ভাবে লঙ্কাপুরীতে অনেক রমণী দেখেছি, এমনকি রাবণ পত্নীদের ও দেখেছি কিন্তু এমন নারীকে দেখিনি। হনু শান্ত হয়ে নিজের পরিচয় ও কি উদ্দেশ্যে লঙ্কা পুরীতে অবরোধ করেছেন তা জানান এবং প্রমীলার লঙ্কাপুরীতে আসার কারণ জানাতে বলেন। হনু তার প্রভু রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে নিবেদন করবেন। হনুর শান্ত নম্র আচরণে প্রমীলাও নম্র আচরণ করে হনুর সঙ্গে।আগে আগে হনু চলছে পথ দেখিয়ে পশ্চাতে রমণীরা; রামচন্দ্রের পায়ে প্রনাম করে নিজের পরিচয় দিয়ে নিজের নিবেদন পেশ করেন। প্রমীলার শৌর্য বীর্য দেখে নরশ্রেষ্ঠ ও দেবকুল প্রিয় রামচন্দ্র ম্রিহমান হয়ে পড়ে। রামচন্দ্রকে প্রনাম করায় প্রমীলাকে সুখে থাকার আশীর্বাদ করে হনুকে আদেশ দেয় শিষ্ঠসম্ভাষনে তুষ্ট

করে লঙ্কা পুরীতে যাওয়ার পথ ছেড়ে দিতে। বিভীষণ জানায় প্রমীলার আগমন কোন নিশার স্বপ্ন নয়; প্রমীলার বংশপরিচয় দেয়। রঘুপতি রামচন্দ্র বিভীষণকে বলে -

"সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে;
কে রাখে এ মৃগ-পালে?"[১৬]

বিচলিত হতে দেখে ভ্রাতা লক্ষণ যথা ধর্ম তথা জয় বলে রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করেন। রামচন্দ্র প্রতি দ্বারে প্রহরীদের অবস্থা খোঁজ করতে লাগলেন। প্রমীলার লঙ্কাপুরী আগমনে কনক লঙ্কাতে বসন্ত ফিরে এলো। রাক্ষসী প্রমীলা স্বামীগৃহ প্রবেশ করে বাঙালি বধুর মতো রণসজ্জা ত্যাগ করে বাঙালি বধূর সাজ সজ্জিত হয়। প্রমীলার রণসজ্জা দেখে কৈলাসে উমা সখী বিজয়াকে বলেন এমন রূপে সেজে সত্যযুগে দানব নাশ করে ছিলাম। প্রমীলার এই রণসাজ দেখে কৈলাসে সখী বিজয়াও চিন্তিত -

"মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ!
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি?"[১৭]

এখানে প্রমীলা রাক্ষস কন্যা কিন্তু বীর সৈন্যের বধু। তাই তার আচরণে শিষ্টতার অভাব লক্ষ্য করা যায়নি। হনুর রূঢ় আচরণে প্রমিলা যেমন ক্রোধে ফেটে পড়েছেন তেমনি শ্রেষ্ঠ বীরের মর্যাদা দিয়েছেন ন্যায় যুদ্ধে বীরত্বের পরীক্ষা করার জন্য রামচন্দ্রের সঙ্গে বামাদলের যার সঙ্গে ইচ্ছা যুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রমীলা। নম্রতার সঙ্গে রামচন্দ্র বামাদালের লঙ্কাপুরীতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রমীলা রামচন্দ্রের পায়ে প্রণাম করে নিজের নিবেদন পেশ করেন। এছাড়া কৈলাসে বিজয়া সখীর প্রশ্নের শঙ্করীকে কি একটু চিন্তা করে তবেই উত্তর দিতে হয়। মধুকবির মানসপটে নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে প্রমীলার চিত্রটি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমগ্র চতুর্থ সর্গ টি আর সকল হইতে পৃথক;সে যেন তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ সাগরের মধ্যস্থলে একটি স্তব্ধ শ্যামল প্রবাল-দ্বীপ-মহাকাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত একটি গীতি-কবিতা। কবি নিজেও এ-কাব্যের সহিত এরূপ শাখা-কাহিনীর (episode) সঙ্গতি সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন না। বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিত একখানি পত্রে তিনি ইহার জন্য একটু কৈফিয়ৎ দিয়াছেন -

> "I think I have constructed the poem on the most rigid principles, and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable, But would you willingly part with it?"[১৮]

তিনটি সর্গ পর্যন্ত পাঠকের ধৈর্যের পর পাঠক মনের কেনর উত্তর সীতার পূর্ব ঘটনার বিবৃতির মধ্যে জানতে পারি চতুর্থ সর্গ 'অশোকবনং' সর্গে। সীতার মনে চঞ্চলতা, ভয়,শঙ্কা, ত্রাস প্রভৃতি ফুটে উঠেছে মধুকবির নিখুঁত বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এই সর্গটি সমগ্র সীতা-সরমার উক্তিটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

নিরাভরণ সীতাকে দেখে সরমা কৌটা খুলে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছেন তার বর্ণনা চমৎকার। সীতার দেহে অলংকার না থাকার জন্য সরমা রাক্ষস রাজ রাবণকে দোষ দিলে সীতা জানায় যে নিজে অলংকার খুলে ফেলেছেন, রাবণ সীতাকে হরণ করলেও অলংকার হরণ করেননি। অলংকার ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসার কারণে চিহ্নস্বরূপ রামচন্দ্র সৈন্য সমেত লঙ্কাপুরীতে আসতে পেরেছেন। গোদাবরী তীরে লক্ষ্মণ সহ দাম্পত্য জীবনের সুন্দর দিনগুলি স্মরণ করে চোখের জল ফেলেছেন সীতা, কখনো পূর্বের ঘটনার কথা স্মরণ করে ভয়ে মুর্চ্ছা যাচ্ছেন। কোকিলগীত, নতুন ফুলের কুড়ি, ভ্রমর, হরিণী প্রভৃতির সঙ্গে খেলা করার পূর্ব সুখের স্মৃতি মনে করে চোখের জল ফেলেছে। সীতার পূর্বকথা স্মরণ করে কখনো মুর্চ্ছা যাওয়ার ঘটনা বা এখন ঘটনার বিবৃতি দিতে গিয়ে কখনো কখনো মুর্চ্ছা যাওয়া নিজেকে দোষী মনে ভাবছে সরমা। মুর্চ্ছা গিয়ে সীতা স্বপ্ন দেখছেন কুম্ভকর্ণ হতো হয়েছে, রাবণ শোকাবেশে এবং রামচন্দ্র জয়ী হয়েছে। দেবকন্যারা সীতাকে সাজিয়ে স্বামীর সামনে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 20
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিয়ে যেতে চাইছে। সীতা সাজতে গিয়ে সময় বিলম্বিত করতে চায় না তাই কাঙ্গালিনী বেশে রামের সামনে যেতে চায়। এ কথা শুনে -

"উত্তরিলা যুরবালা; 'শুন লো মৈথিলি!
সমল খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ হস্তে দান করে দাতা।"[১৯]

কেঁদে, হেসে দেব কন্যাদের সঙ্গে সেজে যখন স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন তখনই স্বপ্ন ভেঙে যায়। সামনে শমনের মতো রাবণ দাঁড়িয়ে তাকে রথে তুলে নেয়। আকাশে গরুড় পুত্র জটায়ুর সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ুর মৃত্যুর সময় রাবণকে সতর্ক করে দিয়ে যায়-

"সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলিত সিংহীরে!"[২০]

দূরে চেড়ীদলের পদ ধ্বনি শুনে সরমা সীতার পদে নমস্কার করে অশোকবন থেকে চলে গেলেন, যার বর্ননায়-

"আতঙ্কে কুরঙ্গীযথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।"[২১]

পঞ্চম স্বর্গ 'উদ্যোগ' সময়কাল নিশীথ রাত্রে থেকে ভোর পর্যন্ত। লঙ্কাপুরীতে রাক্ষস কুল মেঘনাদের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হওয়ার রক্ষস সৈন্য নিশ্চিত জয় হবে এই আনন্দে মত্ত হয়ে আছে। দেবরাজ ইন্দ্র সুখ শয্যা ছেড়ে মৌনভাবে বসে রয়েছেন। ইন্দ্রাণী ভাবছেন দেবরাজ কোনো কারনে অভিমান করে আছেন। ইন্দ্রাণীর অনুরোধে ইন্দ্র জানায় কাল সকালে কেমন করে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে নাশ করবে। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র মেঘনাদের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ নাম নিয়েছেন। দেবতা যার কাছে পরাজিত, কীট সদৃশ্য মানব কীভাবে তাকে যুদ্ধে পরাজিত করবে এইটা ভেবে দেবরাজ বিচলিত, নিদ্রাহীন, দুশ্চিন্তার মধ্যে রাত্রি যাপন করছেন। দৈবী অস্ত্র ইন্দ্র নিজেই চিত্ররথকে দিয়ে রামানুজনকে প্রেরণ করেও যুদ্ধ সম্পর্কে বিচলিত হয়ে মৌনভাবে বসে রাত্রি যাপনের সময় মায়াদেবী এসে আশ্বস্থ করেন। মায়াদেবী স্বপ্নদেবীকে বলেন লঙ্কাধামে গিয়ে সুমিত্রার রূপ ধরে লক্ষ্মণকে স্বপ্ন দেখাতে। বিলম্ব না করে একা গিয়ে লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনের মাঝে সরবরে স্নান করে দানব-দলনী মাতা চন্ডীকে ভক্তিভরে পুজা করতে। স্বপ্নদেবীর আদেশানুসারে ও রামের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মণকে একা ছাড়তে হয় দৈবাদেশের কারণে। পথে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্মণ পূজা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে-

"গরজিল দূরে
মেঘ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা! দুলিল সে ঘোর ভূকম্পনে
কানন, দেউল, সরঃ— থর থর থরে!"[২২]

রাত্রি যাপনের পরে প্রমীলা-মেঘনাদ জননী মন্দোদরীর পদ পুজা করতে এসেছেন। জননী মন্দোদরী সারা রাত্রি অনিদ্রায়, অনাহারে শিবকে পুজা করেও পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। মেঘনাদ জননীর বংশপরিচয় ও তাদের বীরত্বের গৌরবগাঁথা বর্ননা করে জননীকে সান্ত্বনা দিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্পতি পুজা দিতে যেতে চাইলে মন্দোদরীর অনুরোধে পুত্রবধু প্রমীলাকে অন্তঃপুরে রেখে মেঘনাদ একাই যাত্রা করেন। মন্দোদরী আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন-

"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি।
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার।"[২৩]

মেঘনাদের যাত্রাকে প্রমীলা রতি হীন মদনের যাত্রার সঙ্গে তুলনা করে; শোকে মুহ্যমান হয়ে হিমালয় কন্যা জগন্মাতা দুর্গার কাছে পার্থনা করেন; ইন্দ্রজিৎ-এর দেহে কুঠারের আঘাতও যেন স্পর্শ হয়। প্রমীলার আরাধনা কৈলাসে গিয়ে পৌঁছলে ইন্দ্র

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 20
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভয়ে কাঁপতে থাকে ও পবণ দেবতা এই আরাধনা কৈলাসে যাতে স্থায়ী না হয় তাই যত তাড়াতাড়ি পারে প্রবল বায়ু বয়ে উড়িয়ে দিতে চায়। প্রমীলা অশ্রু মুছে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

ষষ্ঠ সর্গে 'বধো' এর সময়কাল প্রভাত। যুদ্ধক্ষেত্রে ন্যায় যুদ্ধে রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ কোনো বীর বধ হয়নি। বিভীষণ ও লক্ষ্মণ কৌশল করে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছেন। রামচন্দ্র বিমাতা কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার কুবুদ্ধির কথা স্মরণ করার মাধ্যমে বর্তমানে কি ঘটতে চলেছে তার একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে বিনা অনুমতিতে প্রবেশকারী লক্ষ্মণকে বিভাবসু অর্থাৎ অগ্নিদেব মনে করে ষষ্ঠাঙ্গে প্রনাম করতে গেলে লক্ষ্মণ তার পরিচয় জ্ঞাপন করেন ও যজ্ঞাগারে আশার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। হঠাৎ কাকা বিভীষণকে দেখে ইন্দ্রজিৎ নিজের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যায়। ইন্দ্রজিৎ পূর্বে যুদ্ধে জয়ের গৌরব একে একে বিভীষণের কাছে ব্যক্ত করতে থাকে। ইন্দ্রজিৎ অনুরোধে করে-

"তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি, ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"[২৪]

প্রত্যুত্তরে বিভীষণ বলে-

"মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী...
রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী..."[২৫]

অন্যায় যুদ্ধে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে দৈবী অস্ত্রের দ্বারা নিধন করার পরে লক্ষ্মণ শিবিরে চলে আসে। শিবিরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। বিভীষণকে সম্ভাষণ করছে ও আনন্দে দেববৃন্দ আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি করছে। জয় সীতাপতির জয় বলে সৈন্যরা উল্লাস করে উঠলে আতঙ্কে রাক্ষস পুরী জেগে ওঠে।

সপ্তম সর্গে 'শক্তিনির্ভেদো'তে প্রমীলা সুবাসিত জলে স্নান করে সুন্দর করে সাজসজ্জা করলে মনের মধ্যে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়। বাসন্তী কে জানায় লঙ্কাপুরীতে কেন হাহাকার রব শোনা যাচ্ছে ও ডান চোখ কেন নাচছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে কৈলাস-সদনে শিব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কীভাবে পরম ভক্ত রাবণকে পুত্র হত্যার কথা জানাবেন। ইন্দ্রজিতের মৃতদেহ বর্ণনায় অসাধারণ চিত্রকল্পের সাহায্য নিয়েছেন-

"পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্র! প্রফুল্ল, হায় কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে!
ব্যথিত অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি।"[২৬]

শিবের আদেশে বীরভদ্র মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ রাবণকে জানালে-

"যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীম-নাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপিত
সভায়!"[২৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 20
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রাম-লক্ষ্মণ-রাবণ-ইন্দ্রজিৎ কাব্যে যেখানে মুল সেখানে যুদ্ধ অনিবার্য হলেও আশ্চর্য যে ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো রথীকে উপস্থিত হতে দেখা যায়নি। এমনকি মেঘনাদের যুদ্ধ, বীরত্বের ছবি মধুকবি আঁকেননি। সপ্তম সর্গে মেঘনাদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে রাবণ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে হত্যার বদলে হত্যাতে অর্থাৎ লক্ষ্মণকে হত্যা করে রাবণ তবে শান্ত হয়েছেন। এখানে মধুকবি প্রতিটি দৃশ্যে বিভৎস ও বীরত্বপূর্ণ সুন্দর চিত্রকল্পের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। চিত্রাঙ্গদা দেবীর মতোও মন্দোদরী ছুটে এসেছেন রাবণের কাছে পুত্র হত্যার কৈফিয়ত নিতে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দেবকুল সহ রঘু সৈন্য যেমন আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিল ঠিক তেমনি লক্ষ্মণের মৃত্যু সীতাপতি রামের হাহাকার বেদনা আরও তীব্র ভাবে ফুটে উঠেছে। অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ;কৈলাশ থেকে শিব প্রতিরোধ করতে না পারলেও নিয়ন্ত্রণ করে গেছেন আদ্যোপান্ত। যুদ্ধ বেশি রক্তক্ষয়ী যাতে না হয় তাই বীরভদ্রকে পাঠিয়ে দিয়েছেন রক্ষোরথীর কাছে। বীরভদ্র রাবণের কানে কানে গম্ভীর ভাবে বললেন শত্রু হত হয়েছে আর অপ্রয়োজনে যুদ্ধ বাড়িয়ে দরকার নেই, এখানেই যুদ্ধ সমাপ্ত করো, বলে বীরভদ্র অন্তর্ধান করলেন। যুদ্ধে পরাজিত দেখে ইন্দ্র সহ দেবতাগণ স্বর্গে চলে গেলেন।

অষ্টম সর্গে সমগ্র রাত্রিকালীন বর্ণনা, 'প্রেতপুরী'তে মাটিতে শুয়ে রামচন্দ্র ভাইয়ের জন্য আক্ষেপ করছে। রামের দুঃখে দুর্গা অভিমানে কাঁদছে। রাবণের জয়ে শিব হেসে লক্ষ্মণের জীবিত হওয়ার পথ বলে দিলেন। মায়াদেবী সহ রামচন্দ্রের যমপুরীতে যাওয়ার পথ ও প্রতিটি দ্বারের বর্ণনায় 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অষ্টম সর্গে উৎকৃষ্ট চিত্রকল্পের ব্যবহারে কাব্যটি উৎকৃষ্ট মর্যাদা ও মহিমাময় আসন লাভ করেছে। বিভিন্ন ধরনের পাপীদের শাস্তির স্বরূপও বর্ণনা করেছেন। পূর্বপরিচিত নর-রাক্ষসদের সঙ্গে দেখা ও প্রত্যেকেই নিজ কর্মের জন্য ফলাফল নিয়ে কেউ আক্ষেপ কেউ আনন্দ করছেন। একে একে মরীচ, খর,দূষণ, বালী, জটায়ু প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়। তবে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে দেখা না হওয়ার কারণ হিসাবে জানায় তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। জটায়ুর নির্দেশিত পশ্চিম দুয়ারে গিয়ে দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রামচন্দ্রের। দশরথের নির্দেশে বায়ুগতি হনু গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরনী হেমলতা এনে লক্ষ্মণকে বাঁচানোর উপায় বলে দেয়। কৃতান্তনগরে নতুন করে পাপ পুন্য অর্জন করা যায় না, তাই রামচন্দ্র পা ছুঁয়ে প্রনাম করতে গেলে-

"কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম। —"[২৮]

নবম সর্গে 'সংস্ক্রিয়া'তে প্রভাতে জয় রাম শব্দে রাবণ জানতে পারে সারণের কাছে গত নিশিতে মহৌষধে লক্ষ্মণ পুনর্বার বেঁচে গেছে। লঙ্কাপতি বিধির বিধান বলে মেনে নিয়ে সাত দিন শত্রু ভাব ত্যাগ করার জন্য রামচন্দ্রের কাছে অনুরোধে জানায়। পুত্রের সৎকারের জন্য সিন্ধু তীরে চিতা সাজানোর আদেশ দেয় রাবণ। সাগর তীরে স্বামী সহ প্রমীলার চিতারোহনের বর্ণনায়-

"চিতায় আরোহী সতী (ফুলাসনে যেন!)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ-বেদী;"[২৯]

চিতার সামনে অগ্রসর হয়ে রাবণ নিজের মনের ব্যথা ব্যক্ত করেছেন-

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে—
সঁপি রাজ্যভার পুত্র, তোমার, করিব
মহাযাত্রা!"[৩০]

সৎকার অন্তিমে-

"করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 20
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ফিরিলা লঙ্কারপানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।"[৩১]

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর ঘটনার প্রেক্ষাপট ও সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত হলেও ঘটনার ঘনঘটায়, অলংকার ব্যবহার ও চিত্রকল্প তৈরীতে অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। চতুর্থ সর্গে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে কাহিনীর সজ্জা তৈরি করেছেন। সে কাহিনীর সঙ্গে এখনকার সীতার অবস্থা মিলিয়ে মিশিয়ে পাঠকের হৃদয়ে একটা করুন রস তৈরি হলেও শেষে একটি তৃপ্তিদায়ক আস্বাদ অনুভূতি হয়। রাবণ বীর তাই পুত্র হত্যার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেও বীর সত্ত্বার কারণে আবার প্রতিশোধ স্পৃহার শত্রু নিধনের জন্য যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে। সপ্তম সর্গে রাবণ যে প্রকৃত বীর তার চিত্র তুলে ধরেছেন। কবির কল্পনায় রাবণকে উচ্চ বীরের মর্যাদা দেওয়ার জন্য কোনো রাক্ষস সৈন্যকে দিয়ে মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ রাবণের কাছে পাঠায়নি। শিব অনুচর বীরভদ্রকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছে। অন্যায় ভাবে মেঘনাদের হত্যা করেছে তাই এই যুদ্ধ কখনোই থামানো সম্ভব নয় তাই শিব কৌশলে দ্বিতীয় বার বীরভদ্রকে পাঠিয়ে শান্ত করেন ও রাবণ যুদ্ধ থেকে বিরত হয়। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের মতো; রাবণের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য শিব কৌশলীর ভুমিকা নিয়ে লঙ্কাপুরীতে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসেন। সপ্তম সর্গে লক্ষ্মণের মৃত্যু না হলে, প্রেতপুরীর মতো একটা অসাধারণ বর্ণনা পাঠক উপহার পেতেন না। অষ্টম সর্গে প্রেতপুরীর বর্ণনায় মধুসূদন বিদেশী কবিদের সাহায্য নিলেও কবির কল্পনার রঙে রঙিন করে যে ছবি পাঠককে দিয়েছেন তা বাঙালির অন্তিম বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে মিশে অপূর্ব চিত্রপট পাঠকের মনে অঙ্কিত হয়ে যায়। তৃতীয় সর্গে কোনো পুরুষ চরিত্র যুদ্ধে সমাগম করছে না;এক নারী প্রেয়স্পদ তথা স্বামী তথা বীরকে বরণ করতে আসছে। মেঘনাদের বীরত্বের কথা সকলে জানলেও বীর জায়া রূপে মধুসূদন প্রমীলার যে চিত্রাঙ্কন করেছেন সেখানে মেঘনাদের ব্যক্তিত্ব, সত্ত্বা আরো বেশি করে ফুটে উঠেছে। প্রমীলার রনরঙ্গিনী রূপ, সৌন্দর্য, বংশ পরিচয়, বীরত্ব, যুদ্ধস্পৃহা, উগ্রতার পাশাপাশি নম্রতা, বাচনভঙ্গির মধুরতা, স্বামী হারা মনি হারা ফনীর মতো উৎকণ্ঠা, সুন্দর আচরণ, শ্বাশুড়ীর সঙ্গে মাধুর্যপূর্ণ ও রুচিশীল ব্যবহার এছাড়া নবম সর্গে সহমরণ সমগ্রটা মিলে রাক্ষস কন্যা নয় যেন বিদেশী নারীর সঙ্গে বাঙালি নারীকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়ে প্রমীলার চিত্রটিকে যতটা উজ্জ্বল করে দিয়েছে তার দীপ্তির ছটায় মেঘনাদের চিত্রটই আরও ঔজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। দুই রাজমাতা, জননী, রাজবধূ হিসাবে চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী চরিত্র দুটিও স্বমর্যাদায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। দুই বধূ পুত্র হারিয়ে স্বামীর কাছে ছুটে এসেছেন তবে ফিরে যাওয়ার সময় রাজার কাছে পুত্র ভিক্ষা চেয়ে কেন পুত্র হত্যা হয়েছে সে প্রশ্ন স্বামী নয় রাজার কাছে রেখে গেছেন। আসন্ন সংকট সম্পর্কে বীরবাহুর জননী চিত্রাঙ্গদার যে আশঙ্কা তা কাব্যের শেষে পরিনতি দান করেছে। মধুকবি কাব্যে কোনো চরিত্রকে অসম্পূর্ণ রেখে যায়নি। কৃতান্তনগরে কৌশলে হারিয়া যাওয়া চরিত্রগুলোর পরিনতি দেখিয়ে দিয়েছেন; কার্য অনুযায়ী আক্ষেপ উল্লাস ফুটে উঠেছে তাদের কথায় মধুকবির লেখনীতে। বিভীষণের চিত্রটি চমৎকার ভাবে অঙ্কন করেন। একদিকে ন্যায় যুদ্ধ অন্য দিকে ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতাদ্বয়ের প্রতি শোকাবেশ দুই বীপরিত চিত্রের দোলায় বিভীষণ চিত্রটি তীব্রতর মাত্রায় ফুটে উঠেছে। লক্ষী দেবীর অবস্থান শুকনো কাষ্ঠে আগুন দিয়ে সরে পড়ার মতো, খুবই অল্প হলেও মেঘনাদের হত্যার জন্য যে roll play করেছে তা পাঠকের নজর এড়িয়ে যায় না। লক্ষীদেবী অলক্ষ্যে থেকে সমস্ত কাজ ইন্দ্র-ইন্দ্রানীকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। মায়াদেবী ও স্বপ্নদেবীর ভূমিকা অল্প হলেও up to date কাজ করে গেছেন। যার ফল স্বরূপ কৌশলে হত্যা সম্ভব হয়েছে। দেবী দুর্গার ও শিব চরিত্রের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত সন্তান, ভক্তের উর্দ্ধে উঠে এসে যেথা ধর্ম সেথা জয় চিত্রটি ফুটে উঠেছে। এছাড়াও অবশিষ্ট চরিত্রের নিঁখুত বর্ণনা মধু কবির কল্পনা দৃষ্টি আতশকাঁচের থেকেও উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়ে।

> "মধুসূদন রাম রাবণের যুদ্ধের মধ্যে এক যুগ-চেতনা - আকাঙ্ক্ষিত নূতন তাৎপর্য সন্নিবেশ করিয়া ইহার আবেদন আরও ঘনীভূত করিয়াছেন।"[৩২]

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ আদ্যোপান্ত চিত্রকল্পের ব্যবহারে কাব্যটি আরও বেশি উজ্জ্বল ও দীপ্তি লাভ করেছে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের তাৎপর্য', সাহিত্য; পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪১১, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৭, পৃ. ১০
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সুকুমার, 'মেঘনাদবধ কাব্য', মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০১২-২০১৩, পৃ. ১২
৩. মুরশিদ, গোলাম, 'আশার ছলনে ভুলি', মাইকেল-জীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ; জানুয়ারি ১৯৯৫, অষ্টম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ২০৬
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার, 'মেঘনাদবধ কাব্য', মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০১২-২০১৩, পৃ. ৯০
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
১৮. মজুমদার, মোহিতলাল, 'কবি শ্রী মধুসূদন', বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলিকাতা ৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত, প্রথম বিদ্যোদয় সংস্করণ (তৃতীয় মুদ্রণ) আগষ্ট ১৯৬৫, নবম বিদ্যোদয় সংস্করণ ২০০৪, পৃ. ৯২
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার, 'মেঘনাদবধ কাব্য', মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০১২-২০১৩, পৃ. ১২৫
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬